স্বর্ণকুমারী দেবী

(১৮৫৬—১৯৩২)

দেবাশিস ভৌমিক

গ্রন্থতীর্থ

GRANTHA TIRTHA CALCUTTA

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

॥ প্রথম কথা ॥

স্বর্ণকুমারী দেবী উনিশ শতকের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন বটে; তবে উত্তরকাল যতটা শ্রদ্ধায় তাঁর চর্চায় বৃত হতে পারতেন, কার্যত তা হয়নি। পর্দার আড়াল থেকে বাইরের পৃথিবীর যতটুকু আঁচ অন্দরমহল পৌঁছাত তা কিছুতেই যথেষ্ট ছিল না উনিশ শতকের পুরুষমুখাপেক্ষী রমণীর কাছে। মেয়েমানুষ, সতী, ঘরের লক্ষ্মী ইত্যাদি রক্ষণশীল অভিধায় নারীকে মুড়ে রাখবার এক নিশ্চিন্ত তৃপ্তির জগৎ খুঁজে নিয়েছিলেন সামন্তশাসিত সমাজের পুরুষ প্রতিনিধিবৃন্দ। নারীর কাছে পুরুষের চাহিদা ছিল লজ্জা, কমনীয়তা, লাস্যময়তা, গৃহসুখ আর শয্যাবিলাস। বহুগামী পুরুষের কথায় উঠতে বসতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার শিক্ষা দেওয়া হত অনূঢ়া বালিকার পিতৃগৃহে। স্ত্রী শিক্ষার সুযোগ বাংলার ঘরে ঘরে সেদিন ছিল অসম্ভবের একশেষ। অবশ্য এঁদের মধ্যে এক আধজন নারী স্বাতন্ত্র্যময়ী হয়ে ওঠার অবকাশ যে পাননি তা নয়। তবে সেক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিক প্রতিভাকে ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠত বিদ্বান স্বামীর শিক্ষানুরাগ

কিংবা উদার আনুকূল্য। তবে তার পরিসংখ্যান নিতান্তই অগণ্য, কিংবা বলা ভালো নগণ্য।

উনিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকটায় স্ত্রী শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা নিদারুণ হতাশা ছাড়া আর কিছুরই জন্ম দিতে পারেনি। সম্ভ্রান্ত দু-একটি পরিবারে অন্তঃপুর-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও অতি সাধারণ বিত্তমধ্য বাঙালি পরিবারে মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে ভাবাটা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের কাছে সময় নষ্ট করারই নামান্তর বলে গণ্য হত। বরং তাঁরা আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলতেন—পড়াশুনো শিখলে মেয়েরা 'বিধবা' হয়। এই ধারণায় শুধু পুরুষ নয়, বিবাহিতা নারীরাও বিশ্বাসী ছিলেন। স্কুল বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' গ্রন্থে সেকালে লেখা হয়েছিল—"শুন লো! যখন স্ত্রী লোক মা-বাপের বাড়ি থাকে তখন তাহারা কেবল খেলাধূলা ও নাটরঙ্গ দেখিয়া বেড়ায়। বাপ মায় লেখাপড়ার কথা কহেন না। কেবল কহেন যে ঘরের কার্য্য কর্ম রাঁধা বাড়া না শিখিলে পরের ঘরকন্না কেমন করিয়া চালাইবি। সংসারের কর্ম দেখাশোনা শিখিলেই শ্বশুরবাড়ির সুখ্যাতি হবে। নতুবা অখ্যাতির সীমা নাই।" যে-কোনো বালকের সঙ্গে উনিশ শতকের বালিকা সহপাঠী হতে পারত না। ভয় ছিল অখ্যাতির—'এ ছুঁড়ি অসৎ হবে।' পিতামাতার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ত চওড়া হয়ে।

এই রকম সামাজিক ভাবনায় জারিত উনিশ শতকের শরীরে সজোরে প্রথম আঘাতটি হানলেন রাজা রামমোহন রায়। ১৮১৯ সালে হিন্দু সমাজপতিদের সঙ্গে বাদানুবাদ সূত্রে তিরের মতো তিনি অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন গুটিকয় হিরের টুকরো। তাতে জ্যোতি ছিল যতটা ধার ছিল তার চাইতে কয়েকগুণ বেশি। রামমোহন লিখলেন—'স্ত্রী লোকদিগের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন যে তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ

বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হইতে পারে; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায়ই দেন না, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন, ইহা কীরূপে নিশ্চয় করেন?' রামমোহন যখন এই প্রশ্নগুলিকে মননের সহবাসী করতে চাইছেন ঠিক সেই সময়ই কলকাতায় প্রথম প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয়ের সূচনা ঘটছে, উদ্যোগী হয়েছেন খ্রিস্টান মিশনারিরা। স্ত্রীশিক্ষার মতো উপেক্ষিত একটি বিষয় নিয়ে সমাজের উচ্চবিত্ত সমাজে ফিসফাস শুরু হলেও নীচের দিকে তখনও তার স্রোত পৌঁছয়নি। কিন্তু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজটা তখন গুটিগুটি পায় অনেকটাই এগিয়ে গেছে নগর কলকাতার বুকে। রাধাকান্ত দেবমশাই আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে উদ্যোগ নিলেন যাতে মেয়েরাও বালকদের সঙ্গে একই ভাবে পরীক্ষায় বসতে পারে। সে ব্যবস্থা হল তাঁর নিজের বাড়িতেই। ১৮১৭ এ 'ফিমেল জুভেনিল সোসাইটি' নামে একটা নতুন সমিতি তৈরি হল। তারা সব ক'টি বালিকা বিদ্যালয় যাতে ঠিকঠাক চলে তার দায়িত্ব নিল। এ ব্যাপারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন ডেভিড হেয়ার, প্যারীচরণ সরকার, নবীনকৃষ্ণ মিত্র, ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার এই উদ্যোগ অনেকটাই মসৃণ পথ পেয়েছিল এগিয়ে যাবার জন্য। পুরোনো দলিল দস্তাবেজ ঘাঁটলে দেখা যায়, সে সময়ে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত ২২৮টি বিদ্যালয়ে মোট পড়ুয়া ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৬,৮৬৯ জন। পরিসংখ্যানটি ফেলে দেবার মতো নয়, বরং বলা ভালো বেশ আশাপ্রদ।

যতদূর জানা গেছে ১৮৭৬ সালে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের চেষ্টায় 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' নামে আরও একটি স্কুল স্থাপিত হয়। অবশ্য তার আগেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আন্তরিক

প্রচেষ্টায় এবং কেশবচন্দ্র সেনের সক্রিয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্রহ্মবিদ্যালয়। এখানেও মেয়েদের পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। নগর কলকাতার বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এইসব বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত প্রয়াসগুলিকে মাথায় রেখেও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চাইলেন গোটা বাংলা জুড়ে এই শুভ উদ্যোগের বিস্তার ঘটাতে। হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদিয়া জেলাতে প্রায় পঞ্চাশটি বালিকা বিদ্যালয় তৈরি হয়ে গেল। ফলে একটা কথা বুঝে নিতে কোনো অসুবিধে হয় না যে, স্বর্ণকুমারী দেবীর শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলিতে অন্ধকার যে ছিল না তা নয়, তবে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে গৃহীত নানা শুভ উদ্যোগ সেই কৃষ্ণগহ্বরে আলোর কণা বয়ে আনছিল একটু একটু করে।

উনিশ শতকের বঙ্গদেশে শিক্ষা সংস্কৃতি রুচিবোধের চর্চা হত যে দুএকটি অভিজাত গৃহের অন্দরমহলে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ছিল তার শিরোভাগে। স্ত্রী শিক্ষা, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক আন্দোলনের চর্চায় তখন মুখর ছিল শহর কলকাতার এই লালবাড়িটি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী এমনই এক সচল চেতনার পরিমণ্ডলে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে, জন্মতারিখ ২৮ আগস্ট। (১২৬৫ বঙ্গাব্দ, ভাদ্রমাস) জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় নদিদি। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদা দেবীর একাদশ সন্তান স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথাগত শিক্ষার কথা তেমন একটা জানা যায় না। মহর্ষি তাঁর বড়ো মেয়ে সৌদামিনী দেবীকে বেথুন স্কুলে পড়তে পাঠালেও স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতি সেই প্রযত্ন চোখে পড়েনি। তবে অন্তঃপুরশিক্ষার আয়োজনে কোনো ত্রুটি ছিল না। ফলে স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রাথমিক পাঠ গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল দুটি বিষয়। এক, অন্তঃপুরের শিক্ষা আর দুই অন্তঃপুরের ভাণ্ডারে মজুত থাকা অসংখ্য বই। এসব নিয়েই যাত্রা শুরু করতে হয়েছিল স্বর্ণকুমারী দেবীকে।

তবে কৃষ্ণনগরের সুপাত্র জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে বিবাহসূত্রে স্বর্ণকুমারী দেবীর চেতনায় লাগল বসন্তের রং, বর্ষার মেদুরতা। বিদ্বান স্বামীর সাহচর্য ও উৎসাহ প্রসঙ্গে সলজ্জ ভঙ্গিতে স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছিলেন—"It was my loving and revered father, Maharshi, Debendra Nath Tagore, who had prepared me for my life's career by giving me an education unusual for Hindu girls of those days. Still, but for the help and encouragement given to me by my beloved husband. I do not think that it would have been possible for me to venture so far. It was he who moulded and shaped me in the fashion that the outside world knows today, and under his loving guidance I passed through stormy waves of literary life as easily and pleasantly, as a good swimmer through a rough sea". 'The Fatal Garland' বইটির ভূমিকায় এমনটাই আনুগত্য, কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা বর্ষিত হয়েছে স্বামীর প্রতি।

১৮৬৭ সালের ১৭ নভেম্বর জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে বিবাহের সূত্রে দিনরাতের বদল ঘটে গেল স্বর্ণকুমারী দেবীর আটপৌরে জীবনচর্যায়। ছোটোবেলা থেকেই গানবাজনা এবং সাহিত্যের প্রতি একটা বাড়তি টান অনুভব করতেন তিনি। ফলে ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'ভারতী' পত্রিকাটি সম্পাদনা করতে বেশ ভালোই লাগত তাঁর। একবার নয়, দু দুবার তিনি 'ভারতী'র সম্পাদক হন। প্রথমবার ১২৯১ থেকে ১৩০১ এবং পরের বার ১৩১৫ থেকে ১৩২১। স্বামীর জীবনদর্শন তাঁকে অভিভূত করেছিল। স্বামী জানকীনাথের সঙ্গে স্বর্ণকুমারীও থিয়সফিতে